দুপুরের পাড়ে
পুকুরের আড়ে

জিয়া হাশান

ঐতিহ্য

গাড়ি-গণকের গাথা
৩

সুপ্রিয় কবীরভাই
(নূরুল কবীর)'কে

গল্পক্রম

গাড়ি-গণকের গাথা ৯
দুপুরের পাড়ে পুকুরের আড়ে ২৭
মাইনাসে মাইনাসে প্লাস প্রোগ্রাম ৪৭
প্রাণ প্রোডাক্ট ৬৮

গাড়ি-গণকের গাথা

শুক্র-শনি দুদিনের লম্বা জাতের সাপ্তাহিক ছুটি কাটায়ে রোববার সকালে ফ্রেশ-মুডে অফিসে এসে বসতেই আতাহার আসে। কোনো অনুমতি না নিয়াই ফস করে আমার রুমে পা দেয়। দু কদম আগায়ে টেবিলের কাছে খাড়ায়।

রাস্তায় গাড়ির, আঁকাবাঁকা কালো রেখায় পা ফেলার, হাঁটাহাঁটি কিংবা দৌড়াদৌড়ি করার অনুমতি দানের মহাজন, আগাগোড়া সরকারের হাতের মুঠোয় পোরা সংস্থা বিআরটিএ, তার মিরপুর আখড়ার একজন পাকা খাদেম সে। ক্লাইন্ট ও অফিসারদের মধ্যকার যোগসূত্রধরও বলা যায় তারে। তবে লোকজনের ভাষায়, এমনকি পত্রপত্রিকার লেখনীতে সে পুরাদস্তুর একজন দালাল।

আতাহারের মতো বিআরটিএর মধুচক্র ঘিরে আরো যারা আছে, সবার জানা– তারা থাকায় ক্লাইন্টদের যেমন সুবিধা, নানা হয়রানির বগলতলায় পড়ে ছটফট করার, লম্বা লাইনে দাঁড়ায়ে সময় নষ্টের আর তাদের দরকার হয় না। বরং আসিবামাত্র কাগজপত্রে সই-সাবুদ পায়। তাতে নতুন গাড়ির লাইসেন্স, পুরানাগুলার বছর মেয়াদি রিনিউ হয়ে যায়। তেমনি নতুন নতুন মডেলের টিভি-ফ্রিজ অফিসারদের বাসায় অনায়াসে গিয়া হাজির হয়। এমনকি সেরকম জাঁদরেল ক্লাইন্ট পেলে বউ-বাচ্চাদের জন্য আধুনিক মডেলের প্রাইভেট কার হাজিরা দিতেও কসুর করে না কখনো কখনো।

তাই আস্তানাজুড়ে সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করা আতাহারদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ের আওতায় আমাদের রাখতে হয়। ফলে না বলে, অনুমতির তোয়াক্কায় না গিয়া আমার মতো জাঁদরেল হিসাবে খ্যাত অফিসারের রুমে হুট করে ঢুকে পড়ার জন্য তারে কিছু বলতে পারি না। বরং কেবল মুখ তুলে প্রশ্নবোধক চিহ্নরে চেহারায় ফুটায়ে তুলি– সাতসকালে কী চাই হে?

– ছার, এই হপ্তার ছুটিতে বাড়িত গেছিলাম।

আতাহারের বাড়ি ঢাকার বগলতলার জেলা মানিকগঞ্জের কোনো গাঁওয়ে। রাজধানীর পশ্চিম দোরগোড়া থেকে ঘণ্টা দুইয়েকের মাথায়। তাই বৃহস্পতিবার অফিস টাইমরে বুঝ দিয়া গিয়া, দুদিন ধরে মায়ের কোলে বসে মুক্ত বাতাস খেয়ে আবার রোববার সকালে যাত্রা করে অফিস টাইমের উঁকি দেবার আগেই পৌঁছতে পারে। এ সপ্তাহেও সে তা-ই করেছে। দুদিন গ্রামে বাড়িতে কাটাইয়া আসছে। কিন্তু তার মধ্যে বাহাদুরীর কী আছে? আমার কাছে এসে তা বুক ফুলায়ে বলার কারণটা কী? তা বুঝতে আমার জিজ্ঞাসু চেহারাটা আরো গাঢ়তর করার চেষ্টা চালাই।

– ছার আমাগো এলাকায় এক চাচায় আইছে। উনার কথায় যেন রাস্তাঘাট উঠবস করে। কালো দেহডারে ব্যাঁকা-ত্যাড়া বানায়। গাড়ি-ঘোড়ারে ঘনোঘনো অ্যাকসিডেন্টে ফালায়।

আতাহারের লম্বা-চৌড়া কথা বলার অভ্যেস। ক্লাইন্টগো কাইত করতে, বুঝাইয়া-শুনাইয়া নিজের মতে আনতে তার তিলরে তাল বানাইতে হয়, ছাগলরে হাতি। তার রেশ কখনো কখনো আমাদের সাথে আলাপেও হাজির হয়। বিশেষ করে যখন উচ্ছ্বাসের আওতায় পড়ে, উত্তেজনার কবলে হাবুডুবু খায়। এখন যেহেতু তাদের যৌথ হাতের মুঠোয় পড়া তাই নিশ্চয়ই তিলরে তরমুজ বানানোর, হাতিরে গাছের আগায় তোলার পথে পা দিছে। সুতরাং তার কথারে আর গুরুত্ব দেয়ার কিছু নাই। বরং ফাইল খুলে কাজে পা দেবার আয়োজন করি।

তখন সে আবার আমার মনোযোগরে কব্জা করার প্রয়াস চালায়– 'ছার, হাচা কইছি। কসম ছার, এক্কেবারে হাচা। নিজের চোখে দ্যাখছি।'

নিজের চোখে কী দ্যাখছে? রাস্তাঘাট সব মানুষের পোষা-প্রাণী, কুকুর-বিড়াল হইয়া গেছে? এখন তাই তারা কারো ইশারায় চলে। উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে তা-ই করে। এ তো গরুরে একেবারে তালগাছে তোলার মতো আজগুবি গল্প, ছাগল দিয়া হালচাষ করার মতো অসাধ্য কাহিনি। সুতরাং এরে বিশ্বাসের ঘরে বসতে দেবার কী দরকার, অ্যাঁ।

– ছার! আপনি হুনলে তাজ্জব হইয়া যাইবেন, ছার।

গ্রামে গিয়া, নিজের দৌরাত্ম্যের জায়গায় হাজির হইয়া নেশা-ভাং খাইয়া কী না কী দেখে আসা, এখন তার লম্বা ফিরিস্তি দিতে বসবে। আর বসে বসে তা আমার শুনতে হবে, অ্যাঁ? তাই তারে নিরস্ত করার উদ্যোগ নিই– এসব গল্প শোনার এখন সময় নাই।

– ছার! শুনলে আপনার বইয়ে কাম দিবো।

আমার বইয়ের কথায় একটু থমকাই। কেননা বিআরটিএতে হর্তাকর্তা হয়ে আছি প্রায় বছর দশেক। ফলে দেশের রাস্তাঘাট, তার বুকের ওপর দিয়া ছুটে চলা চক্রযানগুলা সম্পর্কে হাজারো অভিজ্ঞতা আমার ভেতরে এসে বাসা বাঁধা। স্তরে স্তরে জমা হয়ে ঢিবির আকার নেয়া সারা। তাছাড়া এ পদে একটানা এতো বছর থাকার সৌভাগ্য আর কতজনের হয়? ইতিহাসে ঘাঁটলে দেখা যাবে হয়তো আমি একাই। তাই তা স্মরণীয় করে রাখতে একেবারে নিজের তাগিদে, আত্মার হাতছানিতে সাড়া দিয়া, সরকারি কাজের বাইরে শ'পাঁচেক পৃষ্ঠার একটা বই লেখার, বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলারে কলমের আগার দৌড়ে কাগজে ফুটাইয়ে তোলার উদ্যোগে আছি। তার গোটা চারেক চ্যাপ্টার ইতিমধ্যেই প্রসব করা, কাগজের বুকে কালো কালিতে রূপ দেয়া সারা। সেগুলার চেহারা-সুরত কেমন হইছে, কতোটুকু রূপ-যৌবনের ছোঁয়া দেয়া গেছে তা যাচাই করার জন্য কয়েকজনরে পড়তে দিছি। তারাই এ মহতী আয়োজনের আওয়াজ অফিসময় চাউর করে দিছে। সবার মধ্যে তাই জানাজানিতে পড়ে গেছে।

বিআরটিএ'র অফিসময় সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করা, ক্লাইন্টগো কাগজ-পত্র নিয়া এরুম সেরুমে ঢু মারা আতাহারগো কানে তাই স্বাভাবিক পথে তা পা দিছে। ফলে অনেকে এসে জিজ্ঞাসায় মুখ খোলে- 'ছার! আর কদ্দুর লিখলেন।' কেউ প্রেরণা জোগায়– 'ছার! বই বাইর অইলে আমি এ্যাকলাই সাত কপি কিনমু।' আবার কেউ নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে, তার নিজের দেখা কোনো ঘটনার আগাগোড়া তুলে ধরে তারে বইয়ে ঢুকাতে চায়– 'আমার ঘটনাডা লেইখেন, পাঠক পইড়া মজায় মজবে।'

আতাহারও তার গল্প গছাতে চায়। কিন্তু আজ রোববার, সপ্তাহের প্রথম দিন, টেবিলে জমে গেছে ফাইলের পাহাড়। তাগো সবাইর মন তুষ্ট করার ব্যাপার আছে, আছে সই-সাবুদ দেবার বিষয়-আশয়। তারপর আবার মিনিস্ট্রি থেকে যে কোনো সময় কল আসতে পারে– 'আর্জেন্ট মিটিং, এক্ষুনি চলে আসুন।' সুতরাং আতাহাররে এখন আর সময় দেয়া যায় না। তাই তারে বিদায় করে দেই– 'তুমি এখন যাও, পরে এ নিয়া তোমার সাথে কথা বলা যাবে।'

আতাহার চলে যেতেই পিয়ন দিনের দৈনিকটা আগায়ে দেয়। দেখি তার কপালজুড়ে হেডলাইন– 'ঢাকা-পাটুরিয়া সড়কে মড়ক।' হাতির সাইজের মোটাতাজা হরফ নিয়া সে শোয়া।

অ্যাঁ! এগুলা কি সংবাদপত্রঅলাগো আদি ও অকৃত্রিম কৌশল? চমক জাগানো হেডলাইনের আড়ালে দুচারটা পত্রিকা বেশি বিক্রির ধান্ধা? নাকি

আতাহারের পেয়ারে চাচার কোনো কারসাজি? তার হাতের ইশারার কীর্তি? কেননা এতোদিন তো ঢাকা-পাটুরিয়া সড়ক, দক্ষিণবঙ্গ থাইকা ঢাকায় ঢোকার খোলামেলা বুকের রাস্তা, তা আছিল তুলসি পাতায় ধোয়া পূত-পবিত্র। তার গা-গতরে অ্যাকসিডেন্ট– গাড়িতে গাড়িতে মুখোমুখি মোলাকাত কিংবা একটার ঘাড়ে আরেকটার সওয়ার হওয়া অথবা রাস্তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়া- এসবের কোনো নাম-গন্ধ পাত পায়নি। এখন হঠাৎ করে তারা কোত্থেকে দল বেঁধে এসে, ঝাঁক ধরে হাজির হয়ে মরণের মহোৎসব লাগায়ে দিছে? তাই সংবাদপত্রঅলারা সড়কে মড়কের গন্ধ খুঁইজা পাইছে?

নিশ্চয়ই তার পিছনে আতাহারের চাচার কোনো হাত আছে। কেননা ও বলছিল তার চাচায় হাত ইশারা করে আর ঢাকা-পাটুরিয়া সড়ক ব্যাঁকা-ত্যাড়ায় রূপ নেয়, সাথে সাথে তখন অ্যাকসিডেন্ট আইসা হাজির হয়। তাহলে তো আতাহাররে আবার ডাকা দরকার। তার কাছ থেকে শুনে নিতে হয় আগাগোড়া কাহিনি। তাহলেই সমস্যার গোড়াঘাট জানা যেতে পারে।

কিন্তু তারে ডাকার আগেই সেক্রেটারিয়েট থেকে সচিব মহোদয়ের কল আসে। লোহার মতো ভারী তার গলা– আজকের নিউজ পেপার দেখেছেন? দ্যাখেন, বিআরটিএ নিয়া স্টোরিটা পড়েন। লিখছে, আপনারা ভুয়া লাইসেন্স দেন তাই পাটুরিয়া রোডে এতো অ্যাকসিডেন্ট, সড়কে মড়ক . . .।

– স্যার, এতো অ্যাবসলিউট ফেব্রিকেটেড নিউজ, একেবারে ডাহা মিথ্যা খবর, স্যার।

– মিনিস্টার সাব দেখেছেন। একটা রিজয়েন্ডার দেন, প্রতিবাদলিপি পাঠান।

– জি স্যার!

সে রিজয়েন্ডার, নিউজটারে আগাগোড়া অস্বীকার করার আয়োজনের ড্রাফট ফাইনাল করতে করতে অফিস টাইম পার হয়ে যায়। আতাহাররে ডাকার, তার গরুরে তালগাছের মাথায় চড়ানোর কাহিনি শোনার আর সময় হয় না।

পরদিন লাঞ্চটাইমের নিরিবিলিতে তারে ডেকে পাঠাই। তার কাছে শুনি আগাগোড়া কাহিনি– তার এক গ্রামতো চাচা, তাহের আলী তার নাম, সে অনেকদিন বিদেশে আছিল। মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে হয়তোবা। তখন নানা ধরনের চক্রের ওপর ভর দিয়া ছোটাছুটি করা যান– বাস-ট্রাক, ভ্যান-লরি-কার নিয়া আছিল তার সমুদয় কারবার। বড় কোনো কোম্পানির কার-মেকানিক যেনবা। সে কয়েকমাস আগে দেশে ফিরছে। এখন আর কোনো কাম-কাইজ করে না। কেবল বাড়িঘর দেখাশোনায় সময় কাটায়। আর বাড়ির

কাছের লম্বা-চৌড়া কালো রেখা, ঢাকা-পাটুরিয়া মহাসড়কের পাশের একটা চা-দোকানে বসে। লোকজনের সাথে আড্ডা দেয়। তখন পাশের রাস্তা দিয়া দৌড়-ঝাঁপ করা বাস-ট্রাকের ওপর নজর বুলায়।

আতাহারের এ পর্যন্ত কাহিনি ঠিকঠাক মতো চলে। সরলসোজা লাইন ধরে আগায়। কিন্তু তারপরে যা বলে তার কোনো হিসাব মেলে না। একেবারে বেপথু পথে যেন পা দেয়। কেননা তাহেরচাচা নাকি গাড়ির চেহার-সুরত দেখেই তার ভূত-ভবিষ্যৎ কিংবা মতিগতি বলে দিতে পারে। মানে কোনো চক্রযানের ছুটে চলার আয়োজন, দৌড়ের ভাবভঙ্গি দেখেই বলে দেয়– সে কতদূর যাবে। নিজের গন্তব্যের মাথায় পৌঁছতে পারবে নাকি দু-চার কিলো দৌড়ানোর পর রাস্তার পাশে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অথবা অন্য কোনো গাড়ির সাথে মুখোমুখি মোলাকাতে শামিল হবে। এমনকি কোনো গাড়ির ঘাড়ের ওপর চড়ে বসবে কিনা তাও বলে দেয়।

আতাহারের নিজের দুইদিন চাচার আড্ডায় বসা, আপন চোখে তার কেরামতি দেখা, তারপর তারে যাচাই করে সবগুলায় হান্ড্রেডে হান্ড্রেড মিল পাওয়া সারা। তাই তার এত উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাসের বহর।

কিন্তু এতোদিন মানুষের ভাগ্য-গণকের কথা আমার শোনা। জীবনে দু-চারবার তাদের খপ্পড়েও পড়া। তখন দেখা যে, তারা হাতের রেখা, তার আকার-আকৃতি ও গভীরতা দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দেয়। নিজেরাও টুপাইস কামায়। তেমনি আতাহারের তাহেরচাচাও যেন একজন গাড়ির গণক। বরং দু কাঠি সরেস। হাতের রেখাটেখা কিছু নয়, বরং দূর থেকে কেবল গাড়ির চেহারা-সুরত, তার হাঁটা-চলা ও দৌড়-ঝাঁপ দেখেই তার ভূত-ভবিষ্যৎ বলে, ভাগ্যের পরিণতি বাতলায়।।

– বাট, তুমি বলছিলে রাস্তাঘাট তার কথা মতো চলে। উঠবস করে।

– হ, ছার, চাচায় যহন ইশারা করে, অমনে রাস্তাঘাট যেন ক্যামন ব্যাঁকা-ত্যাড়া হইয়া যায়। গাড়ি আর তহন আগাইতে পারে না। হ্যার ইসপিরিড আউলা-ঝাউলা হইয়া যায়। একটু দূরে যাইয়া অ্যাকসিডেন্টে পড়ে।

এগুলা নিশ্চয়ই কোনো বুজরুকি। গোপন কায়দা-কৌশল কিংবা কোনো জাদুবিদ্যা। কিন্তু সেটা কী? নিজে গিয়া স্বচক্ষে তদন্ত করে আসার প্ল্যান করি। তাতে আর কিছু হোক বা না হোক আমার বইয়ে নতুন একটা চ্যাপ্টার, ইন্টারেস্টিং একটা স্টোরি নিশ্চয়ই যোগ হবে। বুক চিতায়ে দাঁড়াবে।

– আতাহার! নেক্সট উইক্যান্ডে ফ্রি আছি। কোনো সভা-সমিতির দাওয়াত নাই। চলো, তোমার চাচার কেরামতিটা নিজে গিয়া দেখে আসি। তাহলে বইয়ে লিখতে সুবিধা হবে। ঘটনাটা ইন্টারেস্টিংয়ে রূপ নেবে।

দুই

শুক্রবার দুপুরে লাঞ্চরে বুঝ দিয়া আমরা মানিকগঞ্জের উদ্দেশে পা বাড়াই। কারণ আতাহারের ভাষায়, বিকালে তার চাচার আসর বসে, দইয়ের মতো জমে। শেষে খাঁটি ও নির্ভেজাল জমজমাট হয়ে ওঠে।

আতাহার ও আমারে নিয়া আমাদের গাড়ি রাজধানীর পশ্চিম দুয়ার– গাবতলী থেকে বার হয়ে আগায়। মানিকগঞ্জের সদরের বুক চিড়ে ছুটে শিবালয়ে পৌঁছতে পৌঁছতে দিন তার শেষ যাম, বিকালে পা ফেলে। কিন্তু তখনো আতাহারের চাচার দেখা নাই। তবে মোবাইলে কড়কড়ে টাটকা খবর আসে– 'এ্যাই তো বাড়ি থিকা বাইর অইছি। মিনিট দশেক লাগবো।'

আমরা একটা চায়ের দোকান, রাস্তার পাশের টংঘরের সামনে নামি– ওহ! এই তাহলে তাহের আলীর আস্তানা। তার কেরামতি দেখানোর আখড়া। চারিদিকে তাকাই, পুরা এলাকাটা চিনে নেবার আয়োজন করি– জায়গাটার নাম কী?

– ছার, বোয়ালী, ছার।

অ্যাঁ! এ তো সংবাদপত্রে লেখা জায়গা। তাদের ভাষায়– ঢাকা-পাটুরিয়া মহাসড়কের এই বোয়ালী মোড়ই এখন মরণ ফাঁদের চেহারা নেয়া। তাই সে নিত্যদিন দুর্ঘটনা ডেকে আনে। লোকজনরে আহত-নিহতের ঘরে পৌঁছে দেয়। তাহলে তো দুয়ে দুয়ে চার, সংবাদপত্রের লেখা আর আতাহারের চাচার কেরামতির স্থল মিলে যাওয়া সারা।

সংবাদপত্রের নিউজটা পড়া, সেদিন তার প্রতিবাদের ড্রাফট ফাইনাল করতে গিয়া আগাগোড়ায় বারবার চোখ বুলানোয় এখন তা প্রায় মুখস্থ। কিন্তু আতাহারের তাহের চাচার কেরামতিটা তো এখনো না দেখা। সুতরাং যে করেই হোক তারে দেখে যেতে হবে। কেননা তা বইয়ে লিখতে, কাগজে আগাগোড়া ক্লিয়ার করতে গেলে, দেখে নিলে যতটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা পাবে, জলজ্যান্ত হয়ে উঠবে, না দেখে, বানায়ে বানায়ে লিখলে তার শতভাগের একভাগও কি আর ফুটবে? পাঠক পড়ে কি আর মজায় মজবে?

তাই তাহের আলীর অপেক্ষায়, তার হাতের কারসাজি দেখার আকাঙ্ক্ষায় টং দোকানের সামনের দুদিকে দুহাত ছড়ানো লম্বা টুল, চার পায়ের ওপর পিঠ পাতা তক্তায় পাছা বিছানোর উদ্যোগ নিই। সাথে সাথে আতাহার ছুটে আসে– 'ছার, এই দিকে আসেন, এ্যাই চেয়ারে বসেন।'

একটু ফারাকে, ফাঁকা জায়গায় আতাহার একটা প্ল্যাস্টিকের চেয়ার পেতে দেয়। কিন্তু তাতে পাছা বিছায়েও সংশয় যায় না– এতো বড় সরকারি

অফিসার, পুরো একটা সংস্থার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে রাস্তার পাশে বসা, চলন্ত গাড়ির চাকার ছেটানো থুথু, ঘনকালো ধোয়া-ধুলা গায়ে মাখা কি ঠিক হচ্ছে? কেউ, মানে সামনের মহাসড়ক ধরে গাড়ি নিয়া চলা পরিচিত কোনোজন যদি দেখে ফেলে? তাহলে মান-ইজ্জত কি আর থাকবে? তাই আড়ষ্টতারে সাথে নিয়া থাকি। জড়োসড়ো হয়ে বসি।

কিন্তু মানুষ বই লেখার জন্য কতোকিছু করে, হাজারো সাধনায় নামে– রাতের পর রাত বিনিদ্রায় জাগে। কেউ কেউ তো শুনি পাহাড়-জঙ্গলে গিয়া দিনের পর দিন কাটায়, হাজারো দুঃখ-কষ্ট, বনের প্রাণিকুলের হামলার ভয়-ভীতি, তারপর ক্ষুধা-পিপাসা সহ্য করে। শেষে ফিরে এসে বই লেখায় হাত দেয়। তাদের তুলনায় এই রাস্তার পাশে বসা, ধুলো-বালিতে মাখামাখি হওয়া তো একেবারে নস্যি, হাজার ফিটের পাহাড় ডিঙানোর তুলনায় টিলা টপকানো আরকি। তাই আড়ষ্টতারে বিদায় দেয়ার, তারে ঝেড়ে ফেলে জুতসই হয়ে বসার চেষ্টা করি। সাথে সাথে আতাহার আপ্যায়নে আগায়– 'ছার! চা খান। এ্যাই সুরুজ মিয়া ফাসটো কেলাস চা বানায়। আসা-যাওয়ার পথে হাজারো লোকে খায়।'

চায়ে চুমুক দিতে না দিতেই তাহের আলী আসে। তার সাথে আতাহার আমারে পরিচয় করায়ে দেয়। তবে তারে দেখে আমার মোটেই অবাকে পায় না। এতোটুকু বিস্ময় জাগে না। কেননা দেখতে একেবারে সাদামাটা। চেক লুঙ্গির ওপর সাদা রঙের খাটো পাঞ্জাবিতে তার গা-গতর ঢাকা। মুখে হালকা-পাতলা দাড়ি-গোঁফের সমাহার। আর মাথায় খাটো করে ছাঁটা চুল। গ্রামের রাস্তায় দুচার কদম হাঁটলেই এ রকম দুচারজন লোক আজকাল অনায়াসে চোখে পড়ে। কিন্তু তার সাদামাটাত্বে আতাহারের উৎসাহে এতোটুকু ভাটা পড়ে না। বরং জোয়ারের প্রবাহ বইতেই থাকে– 'ছার! আইজ শুক্কুরবার। ব্যাকতের ছুটি। তাই মেলা লোক আসবো। খেলা জব্বর জমবে।'

তবে তাহের আলীর খেলা শুরুই হয় সন্ধ্যা পার হলে। আঁধার একটু ঘন হয়ে বসলে। তখন সে পাশের রাস্তা দিয়া এদিক ওদিক, কেউ রাজধানী পানে মুখ করে আবার কেউ কেউ তারে পাছা দেখায়ে ছুটে যাওয়া হাজারো গাড়ি, চার-ছ চক্রযানের ভেতর থেকে একটার দিকে হাত তোলে। ইশারা করে দেখায়। সাথে সাথে সবাই, টংঘরে সমবেতরা চঞ্চল হয়ে ওঠে। উৎসুক চোখে গাড়িটার পানে তাকায়। তার কী হয়, ভাগ্যে কী জোটে তা দেখতে উদগ্রীব হয়ে পড়ে।

আমিও চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াই। গাড়িটার পানে চোখ বুলায়ে বুঝি– সেটা একটা লোকাল রুটের বাস। নিয়মিত এ রাস্তায় তার যাতায়াত। তার